দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

অভিমত

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ ও প্রতিকার

সমাজ জীবনে ডাকাতি, খুন-জখম, হত্যা, বোমাবাজি এবং রাহাজানিকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলে চিহ্নিত করা হয়। ব্রিটিশ আমলে দেশ স্বাধীনের জন্য এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কার্যকলাপকে দেশ স্বাধীনের উপায় বলে ভাবতেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যারা এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। এবং তাদের অনেককেই দেশের কারণে আত্মদান করতে হয়েছিলো। এরা তাদের এই কর্মকান্ডকে গোপনযুদ্ধ হিসেবে গণ্য করেছিলেন।

দেশ বিভাগের পর নকশাল আন্দোলন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের আর এক রূপ, তবে তা ব্যবহৃত হয়েছে একটি বিশেষ শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এ ধরনের সন্ত্রাসী প্রক্রিয়ায় দেশের কিংবা জনগণের তেমন কোন কল্যাণ সাধিত হয়নি। মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে পরিবর্তিত হয় এবং তখন তাকে দিয়ে মহৎ কার্য সাধন সম্ভব। নকশাল আন্দোলন তাই জনগণ গ্রহণ করেনি।

স্বাধীন বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতার উদ্ভব এবং বিস্তার ঘটে বিশেষ বিশেষ দলের ক্ষমতা এবং অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্যে। স্বাধীনতার পর পরই এসব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে যারা অংশগ্রহণ করছে তারা সকলেই রাজনৈতিক কর্মী এবং বয়সে তরুণ এবং যুবক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অতীতে এদেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ছাত্র, শ্রমিক জনতা অংশগ্রহণ করলেও নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদগণ। তখন যেকোন আন্দোলন তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। কিন্তু পরবর্তীতে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ঠিকমত চালু না থাকায় অথবা গণতান্ত্রিক কর্মকান্ড রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় যথার্থ রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্ম ব্যাহত হয়েছে। যাদের নেতৃত্ব দেবার কথা তারাও ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকেই সুবিধাবাদী হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন গণআন্দোলনে আমরা লক্ষ্য করেছি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা অপেক্ষা ছাত্র জনতার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখন ছাত্রদের ব্যবহার করেছেন নিজেদের স্বার্থে। শিক্ষাঙ্গনগুলো তখন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনই প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনের ছাত্র সংগঠন রয়েছে। একদল অপর দলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতাকে বেছে নিয়েছে এবং তারা রাজনৈতিকভাবে আশ্রয়ও পেয়েছে। এদের সকলের কাছেই অস্ত্র থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দেশ স্বাধীনের সময় স্বাভাবিক কারণেই অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল ব্যাপকভাবে। তবে স্বাধীনতার পর এসব অস্ত্র যথাস্থানে ফিরে আসেনি। অবশ্য ফিরিয়ে নেবার মতো ছিটেফোঁটা প্রচেষ্টা হলেও প্রচেষ্টাকারীদের তেমন আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততা ছিল না অনেকটা তাদের স্বার্থের কারণেই। সুতরাং সমাজে কিংবা শিক্ষাঙ্গনে কোথাও অস্ত্রের কোন ঘাটতি পড়েনি। রাজনৈতিক কারণে সমাজে এবং শিক্ষাঙ্গনে তার যথেচ্ছা ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করেছি। এবং এসব ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই ছাত্র এবং ছাত্রনামধারী।

দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এদেরকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। এখানেও আন্তরিকতা কিংবা বিশ্বস্ততার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য তাদের নিক্রিয়তার মূলে রাজনৈতিক প্রভাব অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং সরিষার মধ্যেই ভূত থাকার কারণে সরিষাকে ভূত তাড়াবার কাজে ব্যবহার করা যায়নি।

বিগত বছরগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের আত্মপ্রকাশ প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তা সম্প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন কলেজে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুলে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তা তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে এসব সন্ত্রাসী তৎপরতায় ছাত্রছাত্রী কিংবা ছাত্রনামধারীদের সাথে একই মতাবলম্বী এক শ্রেণীর শিক্ষকও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এঁরা তাদের রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে ছাত্র ভর্তি করেছেন, পরবর্তীতে তালিম দিয়েছেন এবং যোগ্যতা না থাকলেও তাদেরকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেও সাহায্য করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দেশের আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রত্যক্ষ রাজনীতি নিষিদ্ধ না থাকায় তারা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং করছেন। সন্ত্রাসী তৎপরতায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে তারা মদদ জুগিয়েছেন। আশ্চর্য লাগে এঁরাই আবার সন্ত্রাসী ছাত্রদের মতই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও মুখর হয়েছেন।

আমার এই বক্তব্যে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করতে চাই।

এক : এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা সন্ত্রাসকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের স্বার্থে।

দুই : এক শ্রেণীর শিক্ষক যারা উল্লিখিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দোসর এবংসুবিধাভোগী।

তিন : দুর্বল প্রশাসন যারা রাজনৈতিক প্রভাবের শিকার।

চার : উল্লিখিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং এক শ্রেণীর শিক্ষকদের দ্বারা ব্যবহৃত ছাত্র সংগঠনের ছাত্রছাত্রী এবং ছাত্রনামধারী তরুণ সমাজ।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করতে চাই। আমরা সকলে হয়তো বেনীর মাসির গল্প জানি। যারা জানেন না তাদের জন্যে বলি :

বেনী পিতৃ মাতৃহীন অবস্থায় গ্রামের এক মাসির কাছে লালিত পালিত হয়। মাসির অবস্থা ভালো ছিল না এবং অভাবের সংসার। অত্যাধিক স্নেহের বশবর্তী হওয়ায় মাসির কোন নিয়ন্ত্রণ বেনীর উপর ছিল না। বেনী ছোট ছোট চুরিতে লিপ্ত হয়ে পরবর্তীতে ডাকাত হয়ে পড়ে এবং খুন রাহাজানির দায়ে ফাঁসির আসামী হয়ে পড়ে। বেনীর মৃত্যুদন্ডের দিন বেনীর শেষ ইচ্ছানুসারে বেনীর মাসিকে শেষ দেখার জন্য উপস্থিত করা হয়। অতঃপর ক্রন্দনরতা বেনীর মাসির সঙ্গে বেনী কানে কানে কথা বলার সময় বেনী কামড় দিয়ে মাসির কান কেটে নেয় এবং বলে, মাসির জন্যই তার এই দুর্গতি। ছোট বেলা থেকে মাসির কানে বেনীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এসেছিল যথাসময়ে তার ব্যবস্থা নিলে বেনীর ফাঁসি হতো না।

এখানে বেনীর বক্তব্যে অভিভাবকদের চরম দায়িত্বহীনতা ধরা পড়েছে এবং বস্তুতঃ এটা স্পষ্ট হয়েছে বেনীদের দুর্গতির জন্যে অভিভাবকদের দায় ভাগই সমধিক। বেনীর ঘটনা থেকে আরও যে তথ্য উদঘাটিত হয় তা হলো :

এক, অভিভাবকদের সুবিধা ভোগ, যেমন বেনীর মাসি কর্তৃক বেনীর চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির সামগ্রী এবং সম্পদ ভোগ।

দুই, সমাজে স্বার্থ সিদ্ধির প্রভাব বিস্তার। যেমন বেনী মাস্তান হওয়ার কারণে আশপাশের লোকজন বেনীর মাসির নানা অন্যায় কার্যকলাপ প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না।

তিন, অভিভাবক হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। যেমন স্নেহের বশবর্তী হওয়ায় বেনীকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি এবং বেনী কোন অন্যায় করতে পারে না বলে মাসির একপেশে ধারণা।

এবারে আমাদের সমাজ জীবনের ঘটনায় ফিরে আসি। সন্ত্রাসে অংশগ্রহণের পূর্বে আমাদের তরুণ ও যুবক সমাজ রাজনীতির ছত্রছায়ায় দুর্নীতি, অপরাধ ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এরা পিতা মাতা এবং স্কুল কলেজের শিক্ষক অপেক্ষা রাজনৈতিক কিংবা ছাত্র নেতৃবৃন্দের প্রতি অতি মাত্রায় আনুগত্যশীল। প্রাথমিক পর্যায়ে এদের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ না করার ফলে দুর্বল অভিভাবকত্বের কারণে এরা ক্রমে ক্রমে উচ্ছৃংখল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক মনোভাব পুষ্ট শিক্ষা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাহচার্য থেকে এরা নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করে থাকে। এদের অন্যায় কার্যকলাপ, দুর্নীতি এবং অপরাধ রাজনৈতিক প্রচ্ছায়ায় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় না। ফলে ধীরে ধীরে তাদের উগ্রতা এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে সন্ত্রাসে রূপ পরিগ্রহ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অনেক বেকার যুবক এবং তরুণ এইসব রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এসে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এদের অর্থ বিত্তেরও কোন অভাব হয় না। এদের অধিকাংশেরই সংসার নির্বাহ হয় রাজনৈতিক সুবিধা ভোগের কারণে। এটাও যেন এক প্রকার চাকুরী। এরা প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছে এবং তার বিনিময়ে কেবলমাত্র দলের স্বার্থ রক্ষার জন্যই সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়েছে। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের ব্যবহার করেছেন এবং এই সব তরুণ সন্ত্রাসীরাও তাদের প্রয়োজনে এইসব অক্ষম এবং দুর্বল রাজনীতিকদেরকেও ব্যবহার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের এক শ্রেণীর শিক্ষক সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত ছাত্রদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে শিক্ষাগত ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা লাভে সাহায্য করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন শিক্ষাঙ্গনে এক শ্রেণীর শিক্ষক এবং কর্মচারী এসব সন্ত্রাসী ছাত্রদের নানাভাবে এবং নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। এদের দ্বারাই শিক্ষাঙ্গন হয়েছে, তাদের জিম্মি। এদের কারণেই সৎ শিক্ষককে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুও বরণ করতে হয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ আমরা নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করতে পারি।

এক, দুর্বল এবং অসৎ অভিভাবকত্ব।

দুই, রাজনৈতিক মতবাদপুষ্ট অসৎ শিক্ষকদের সুবিধাভোগী মানসিকতা।

তিন, দুর্বল এবং অসৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

চার, দুর্বল এবং সুবিধাভোগী প্রশাসন।

উল্লিখিত কারণসমূহ দূরীভূত করতে হলে জাতীয়ভাবে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়েছে রাজনীতির অসৎ ব্যবহার সমাজ এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রসার ঘটিয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে অসৎ রাজনীতি এবং তার সাথে যুক্ত সকলকে প্রতিহত করতে হবে। এবং তা তখুনি সম্ভব, যদি সরকার এবং সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে সন্ত্রাসরোধে ঐক্যমতে উপনীত হন এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজসমূহে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসহ সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের অবিলম্বে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজসমূহে ছাত্র সংগঠনকে যথার্থ নেতৃত্ব গঠনের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে এবং এসব সংগঠনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে এবং কোন অবস্থায়ই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসব ছাত্র সংগঠনকে তাদের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। এসব ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে ব্যাপৃত থাকবে। ক্ষমতাসীন দলসহ সকল রাজনৈতিক সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে তাদের কোন কর্মকান্ড অনুসরণ করতে পারবেন না। চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাউকেও রাজনৈতিকভাবে কোন সুবিধা প্রদান করা চলবে না। অসৎ শিক্ষক এবং সন্ত্রাস ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তাদের নিজস্ব ধারায় ব্যবস্থা নিতে দিতে হবে এবং সর্বতোভাবে তাদেরকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এবং প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সর্বতোভাবে তাদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে হবে এবং যারা এ পরিবেশকে নষ্ট করার কাজে লিপ্ত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষকগণ শিক্ষকতা ও গবেষণা কাজে নিবিষ্ট থাকবেন এবং জাতীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সুপারিশ করবেন। এসব সুপারিশগুলো জাতীয় পর্যায়ে আলোচিত হবে এবং তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, কারো পক্ষে এ দায়িত্ব এককভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, সুতরাং সমগ্র জাতিকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। তা না হলে আমাদের বাঁচার আর কোন পথ নেই।

—ডঃ আনোয়ারুল করিম
অধ্যক্ষ, মেহেরপুর সরকারী কলেজ